তোমার অনুপস্থিতির সুযোগে তোমাকে নিয়ে কিছু কথা

তন্ময় মৃধা

যখন ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল ছিল না তখন আমরা যারা পুরীর সমুদ্র দেখেছি সেই দেখাটাকে আমরা বর্ণনা করি একটা অভিজ্ঞতা হিসাবে। লোকে যখন টিভি চ্যানেল দেখে বেড়াতে যেত না, ফলে কোনো না কোনো ধরনের স্থির চিত্রই ছিল তার কাছে ওই টোপোগ্রাফির একমাত্র রেফারেন্স। ফলে অভিজ্ঞতা হত। ভোর ভোর ওই প্রথম সমুদ্র দর্শনটা আমাদের বয়সীরা এমনকি কিছু পরের মানুষরাও পর্যন্ত মনে করতে পারবে। উত্তাল, দণ্ডায়মান, সশব্দ, দিগন্ত-দূরত্বের তোয়াক্কা না করা একটা অতিকায় কিছু— যা আমি ভেবেছিলাম কিছুটা যেন সে রকমই আবার অনেকটাই যেন অভাবনীয়। এক কথায় স্টুপেন্ডাস। এই ভনিতাটা আসলে অচ্যুত মণ্ডলকে মনে রেখে। যে না কি বলতো আমি প্রথমে মণ্ডল তার পর অচ্যুত। ১৯৮৭ সালে তাকে দেখা ওই সময়ের যে কারোর প্রথম সমুদ্র দেখার সমতুল অভিজ্ঞতা। আমরা যখন বাংলা বিভাগে তাকে সহপাঠী হিসাবে পেলাম তার আগেই প্রেসিডেন্সি কলেজে তার এক বছরের জন্য ইতিহাস পড়া শেষ

অচ্যুত মণ্ডল
(১৯৬৮–২০০৯)

হয়েছে। রোগা পাতলা, বেঁটে খাটো, শ্যামলা রঙের ছেলেটা কথা বলে, অনর্গল কথা বলে। সব বিষয়েই বলে। ২১ জন নতুন সহপাঠী অচিরেই বুঝে গেলাম সে-ই কথা বলবে এবং শেষ কথা বলবে।

দিনদুনিয়ায় এমন কোনো কাজ নেই যার প্রতি শ্রদ্ধা এবং কিছুদূর অবধি গৌরব বোধ না থাকলে তাকে নিজের কাজ বলে মনে করা সম্ভব। যারা নৌকো বানায় তারা বিশ্বাস করে নৌকো বানানো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাজ। ফলত নৌকো বানানো গৌরবের। আমরা যারা বিচ্ছিন্নভাবে, অভিমুখহীন মুদ্রাদোষবশত ছবি আঁকতাম কিংবা কবিতা লিখতাম, কখনোই বুঝতাম না যদি অচ্যুত মণ্ডল আমাদের না জানাতো এই পেশা গম্ভীর, গভীর এবং শ্রদ্ধেয়। কবি শিল্পী যে ঈশ্বরপ্রতিম এই দাবি অচ্যুতের। সৃষ্টিশীল তরুণরা মনে মনে কালে কালে হয়তো এরকমই একজনকে খোঁজে যে শিল্পের এই স্বরাটের দাবি করবে। আমরা সৌভাগ্যবান, কারণ আমরা সেই মনের মানুষের সন্ধান পেয়েছিলাম। অপরাধীদেরও একটা নিজস্ব জগৎ থাকে। অচ্যুত মণ্ডল আমাদের জন্য একটা জগৎ তৈরি করল। যে জগতে লেখাটা আর হেলাফেলার কাজ নয়, আঁকাটা তুচ্ছ নয়। শিল্প বড়ো—লার্জার দ্যান লাইফ। নৌকো বানানো লোকটার মতো আমরাও একদিন বলতে শিখলাম— হ্যাঁ ভাই আমি ছবি আঁকি কিংবা আমি কবিতা লিখি। সে না থাকলে শিল্পের প্রতি, সৃজনশীলতার প্রতি এই সম্ভ্রমবোধের দীক্ষা থেকে সমকালীন পশ্চিম বাংলার অনেক তরুণ হয়তো বঞ্চিত হত।

জানি না, কে আমাদের জানাতো র‍্যাঁবোর কথা, ব্যোদলেয়ারের কথা, দস্তয়েভ্‌স্কির কথা, জাঁ জেনে, কাফকা, কামু বা জাঁ পল সার্ত্রের কথা। জানি হাস্যকর শোনাচ্ছে। কিন্তু সত্যি বলছি, এমনকী প্রেসিডেন্সি কলেজের ক্লাস রুমেও এঁদের নাম সচরাচর নেওয়া হত না। আমরা বুদ্ধদেব বসুকে দেখিনি। আমরা দীপক মজুমদারকে চিনি না। আমরা এই অচ্যুত মণ্ডলকে চিনি। সেই আমাদের মিগুয়েল দে উনামুনো (১৮৬৪-১৯৩৬)। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন এই স্প্যানিশ কবি-দার্শনিক-অধ্যাপকের কথা। সালোমাংকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিঁড়ি যদি প্রেসিডেন্সি কলেজের পোর্টিকো হয়, যদি উনামুনো শব্দের অর্থ হয় বিজয়ী, তাহলে অচ্যুত নিঃসন্দেহে আমাদের উনামুনো। অবিসংবাদিত প্রবক্তা। তার অমোঘ আকর্ষণে সমকালীন সৃষ্টিশীল তরুণ তরুণীরা একসময় নিয়মিত ছিল এই পোর্টিকো, প্রমোদদার ক্যান্টিন, ইউনিভার্সিটির পাঁচিল লাগোয়া বুড়োদার চা-দোকান, হিন্দু হোস্টেলের ৩২নং ঘর হয়ে কফিহাউস অবধি। আর অ্যাডাল্টদের জন্য ছিল কলাবাগান, নয়তো খালাসিটোলা। তারই মধ্যস্থতায় আমরা মিলতে পেরেছিলাম অগ্রজ কবিদের সঙ্গে।

তার নেতৃত্ব অপ্রতর্ক। মতামত আর মতবাদের ঝরনাধারা সে। কবিতা কি, ছবি কি, নন্দনতত্ত্বের গলিঘুঁজি, নির্মাণ-সৃষ্টির খুঁটিনাটি, এমনকি প্রেম, একগামিতা, বহুগামিতা,

মান-অভিমান, ভালোবাসা, ঘৃণা, রাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন, নৈতিকতা সব বিষয়েই তার বলার আছে।

কে এই অচ্যুত মণ্ডল? জনশ্রুতি, মেদিনীপুর থেকে বন্যাতাড়িত হয়ে কলকাতায় চলে আসা একটা পরিবার, যারা নাকি পরবর্তীকালে সেটল করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সরিষা-বিষ্ণুপুর অঞ্চলে। এরপর বাবার চাকরি সূত্রে শিলিগুড়ি। আজন্ম শিলিগুড়ির ছেলে। শিলিগুড়ি বয়েজের মেধাবী ছাত্র অচ্যুত মণ্ডল; উচ্চশিক্ষার জন্য পাহাড়ের কোল থেকে উচ্চগতির তিস্তার কোল থেকে যার গাঙ্গেয় কলকাতায় নেমে আসা। শিলিগুড়ি নিয়ে ফ্যানটাসি আর ফ্যাসিনেশনের অন্ত ছিল না তার। শিলিগুড়িকে সে সম্ভবত ইয়োরোপ বা নিদেনপক্ষে ইংল্যান্ডের কোনো মফস্‌সল শহর বলেই মনে করত। তবে অচ্যুত মণ্ডল যে অত্যন্ত মেধাবী ছিল এ ব্যাপারে তার অধ্যাপক সহ সংশ্লিষ্ট কারোরই কোনো সংশয় ছিল না। অনেক পরে আমি একবার পাহাড় থেকে দার্জিলিং মেলে ফিরছিলাম। আমার পাশেই বসা কিছু তরুণ শিলিগুড়ি, শিলিগুড়ি বয়েজ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল। তাদের আলোচনা থেকে নীরবে আমাকে জেনে নিতে হল শিলিগুড়ি বয়েজের সর্বকালের সেরা ছাত্র অচ্যুত মণ্ডল। কত ডাক্তার এঞ্জিনিয়ার শিলিগুড়ি বয়েজ থেকে বেরিয়ে দুনিয়াদারী করছে তবু অচ্যুত মণ্ডলই সেরা। সেরা সেটা আমরাও মানি। কিন্তু কিছুতেই রহস্য ভেদ করতে পারি না, এত মেধাবী একজন, যে নাকি থেকে থেকে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হচ্ছে, তার হোস্টেলের ঘরে কিন্তু বই দেখিনি কক্ষণো। ভ্রমণের সময় ছাড়া সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় তাকে কখনো বই পড়তে দেখিনি।

পছন্দসই গান শুনতে পেলে উদ্ধত মাথাটা নুয়ে পড়ত খানিকটা। চোখে জল দেখা যেত। অনেক গানের মধ্যে মনে পড়ছে— *আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার, আমার সকল নিয়ে বসে আছি, আজি শ্রাবণঘন গহন মোহে* বা *কেন সারাদিন ধীরে ধীরে বালু নিয়ে শুধু খেলো তীরে*।

উত্তেজনার মুহূর্তে ইংরেজিতে ক্রিকেটের এক টুকরো রানিং কমেন্ট্রি করত— যেখানে মাঠের ঘাস চিরে বিদ্যুৎ গতিতে বেরিয়ে যাচ্ছে বল। এবং অনিবার্য চার। চার, কারণ আমাদের সময় টেস্ট ক্রিকেটটাই বেশি হত। এবং কমেন্ট্রিটা অবশ্যই রেডিও থেকে নেওয়া। কথায় কেউ কাউকে দাবিয়ে দিতে পারলে তার প্রিয় লব্জ ছিল চাপা হাসিসহ— 'বিলো দ্য বেল্ট'। খেলা নিয়ে এত কিছু। আর সত্যিকার খেলার মাঠে সে কিন্তু কপর্দকহীন বালকের মতো। সেসবও আমার দেখার মতো ঠেকেছে।

অচ্যুত মণ্ডলের অন্যতম একটি সদ্‌গুণ হল মারপিট করার ক্ষমতা ও আগ্রহ। সদগুণ বললাম, কারণ সে নিজে তাই বিশ্বাস করত। এক সময় সে সার্থক রায়চৌধুরীকে সার্টিফাইও করেছে— না ছেলেটার এলেম আছে, মারতেও পারে আবার লিখতেও জানে। যাই হোক, সরস্বতীর বরপুত্রের এ হেন মহিষাসুরসুলভ আচরণে অভ্যস্ত ছিল প্রায় সকলেই।

কোনো সিরিয়াস কারণ ছাড়াই মারপিট করাটা তার প্যাশন। গল্প করব না ভেবেছিলাম। তবু একটু না করলেই নয় মনে হচ্ছে। আমি আর সার্থক দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে সেমিনার দিতে গিয়ে অচ্যুতের ফ্লাটে উঠেছি। সার্থকের একটু বীফ্ বাতিক আছে। সেমিনারের পরের দিন রাত্রিবেলা সার্থক বীফ্ এর প্রসঙ্গ তুলল। আমরা সবাই জানি দিল্লিতে কাগজে কলমে বীফ্ নিষিদ্ধ। দু'জনের মধ্যে এই নিয়ে বেধে গেল, মানে তুমুল তর্ক। অচ্যুত বলছে এখানে বীফ্ পাওয়া যায় না, যাবে না। সার্থক বলছে পাওয়া যায়, যাবে। কয়েকজন মুসলিম অধ্যাপক ও ছাত্রকে ফোন করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হল। আর চেষ্টা! মুহূর্তে বিষয়টি তর্কাতর্কি থেকে হাতাহাতিতে রূপান্তরিত হল। এরকম অজস্র। জানি না, এ ব্যাপারে তার রোল মডেল কে ছিল। তবে এই ধরনের অবস্থানের সুফল কুফল দুইই আছে। যেমন ধরুন, কথায় বলে বোবার শত্রু হয় না। অচ্যুত মণ্ডল কিন্তু বোবার শত্রু ছিল। বোবা সাধারণত দু'ধরনের হয়। একদল স্বভাবতই বোবা। অন্যেরা জেনে বুঝে বোবা। আমি কিন্তু চারপাশে এই দুই প্রকার বোবাদের বিচলিত হতে দেখেছি, এমনকি অনেকটা পাল্টাতেও দেখেছি অচ্যুতের বাঙ্ময় উপস্থিতির কারণে। ভয় পেত, অচ্যুতকে লোকে ভয় পেত, বুঝে চলত। কারণ কবিতার মতো, মানুষ আর জীবনযাপন নিয়েও তুমুল নাড়াঘাঁটা করেছে সে। যা স্বাভাবিকভাবে না করার তাই করেছে, যা সামাজিকভাবে না বলার তাই বলেছে। ফলত কোথাও তার উপস্থিতি মানেই কিছু না কিছু বিচলন। নিজের চেপে রাখা, না বলা কথা, তার মুখ থেকে যখন দ্ব্যর্থহীন ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে শুনেছে; নিজের সামনে কোনো না কোনো ভাবে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি।

কবিতার সঙ্গে, লেখালেখির সঙ্গে তার দু'রকমের সম্পর্ক। এক—লেখক অচ্যুত মণ্ডল, দুই—পাঠক অচ্যুত মণ্ডল। এই দুই অবস্থানেই সে সমান প্যাশনেট, কঠোর, ক্ষুরধার এবং যুক্তিবাদী। নিজের লেখা নিয়ে তৃপ্তি ছিল না কখনো। আত্মতুষ্টিও না। পরীক্ষা নিরীক্ষার চূড়ান্ত করেছে। সাহিত্যের একাধিক মাধ্যমে ব্যক্ত করতে চেয়েছে নিজেকে। তার প্রকাশিত একমাত্র কবিতাগ্রন্থ 'একটি তারার তিমির'-এর কবিতাগুলি ছাড়াও রয়ে গেছে তার আরও কবিতা, ছোটোগল্প, অনু উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ। আর পাঠক অচ্যুত মণ্ডল! নতুন বাংলা কবিতা তাকে প্রথম শোনানোটাই ছিল রীতি।

সর্বোপরি, তাকে ঠিক কী রকম দেখতে ছিল একটু বলা দরকার। প্রাতিষ্ঠানিক নীরবতা, চালাকি আর গাম্ভীর্যের চিরশত্রু ছিল সে। সে ছিল ছ্যাবলা, তাড়িত, মজার আর আদ্যন্ত রসবোধসম্পন্ন একজন রক্তমাংসের মানুষ। ঘুম তার কাছে সম্ভবত সবচেয়ে ক্লান্তির ছিল। সে ছিল জাগ্রত, মুখর এবং চঞ্চল। নির্দিষ্ট কোনো পরিচয়ের ঘেরাটোপে নিজেকে আবদ্ধ করতে রাজি ছিল না কখনো। সে চেয়েছিল নিজেকে, নিজের সীমাবদ্ধতাকে বার বার অতিক্রম করে যেতে।

বরাবরের ভ্রমণ-বিদ্বেষী হওয়া সত্ত্বেও নিজের পয়সায় ভ্রমণ করেছে প্যারিস। খালি হাতে বসে থেকেছে দিল্লির আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে, যতক্ষণ না তার ছাত্ররা তাকে নিতে আসতে পেরেছে। ভ্রমণ করেছে লাদাখ, আর বিদঘুটে হাসাহাসি করেছে লাদাখের সাংঘাতিক ঠান্ডা নিয়ে। আদ্যন্ত ক্যামেরা বিমুখ তবু তার কিছু না কিছু ভালোমন্দ ছবি হয়তো রয়ে গিয়ে থাকবে কারুর না কারুর জিম্মায়। গভীর রাতে একা চলে গিয়েছে সরিষা-বিষ্ণুপুরে পৈতৃক ভিটের সন্ধানে। নিজের বৃদ্ধা ঠাকুমাকে প্রায় আমৃত্যু দেখাশোনা করেছে কোচবিহারে থাকার সময়। দরিদ্র আত্মীয়কে অর্থসাহায্য করেছে স্বেচ্ছায়, আর স্বেচ্ছায় অস্বীকার করেছে সমস্ত সম্পর্ক, সমস্ত আত্মীয়তা, সমস্ত ভালোবাসা, সমস্ত অঙ্গীকার। সজ্ঞানে এবং প্রায় অকারণে সে চুকিয়ে দিয়েছে যাবতীয় প্রিয় সম্পর্কের সকল মধুরতা। একগামিতার সুদৃঢ় তত্ত্ব আলগা হয়েছে দিনে দিনে। ধীরে হলেও দ্রুত ভেঙে গেছে ভালোবাসা আর বৈবাহিক সম্পর্কের প্রতি তার ঘোষিত আস্থা। ধীরে হলেও দ্রুত সে লিপ্ত হয়েছে একাধিক সম্পর্কে। ঠিক যে রকম দ্রুততায় সে বদল করেছে তার নিজস্ব পরিপার্শ্ব, বাসস্থান অথবা কর্মস্থল।

আলোর চেয়েও দ্রুতগামী অচ্যুত মণ্ডল। এই দ্রুতি সে উপভোগ করেছে একদিন। তীব্র গতির সামনে হতচকিত ছোটোখাটো ছায়ামানব ছায়ামানবীদের সে উপভোগ করতে চেয়েছে এবং পেরেছেও কিছু অবধি। তারপর একদিন নিজেই সে অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে এই গতির অংশ হিসাবে। কিছুই ধরে রাখেনি সে, কিছুই জমিয়ে রাখেনি। গতি, নেতি, অফুরন্ত অস্বীকার আর আদিম উদ্বাস্তু প্রবণতার মিশ্রণে যে পাহাড় নিজেকে ঘিরে রচনা করেছিল অচ্যুত— তার মৃত্যু সম্ভবত সেই পাহাড়টিরই শীর্ষবিন্দু।

যে লক্ষ্যমাত্রা, যে স্বপ্ন, যে স্থানাঙ্কের কথা সে ভেবেছিল, হয়তো, ক্রমশ সে দূরত্ব বোধ করেছিল সেই আদি কল্পনার সঙ্গে। নোঙর করবার মতো বন্দর হয় সে দেখতে পায়নি নয়তো সে পেরিয়ে এসেছে অজান্তে। যে আশ্রয়ের স্বপ্ন দেখেছিল সে, এ দিকে হয়তো ও রকম ঘরবাড়ি ছিল না। হয়তো সে জেনে গিয়েছিল, যত বড়ো রাজধানী, তত বিখ্যাত নয় এ হৃদয়পুর।

অনেকেই তবু নানা অসঙ্গত কারণে এখনও মনে করে অচ্যুত মরেনি। নতুন কোনো একটা ছক কষছে গোপনে। এ রকম ভাবনার কোনো যৌক্তিকতা নেই। বরং আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি, ইহজীবনে কেউ আর কোনোদিন আমাদের বিরক্ত করবে না, আমাদের সঙ্গে কোনো মর্মে কোনো ভাবে ঝগড়া করবে না, ঝঞ্ঝাট করবে না, কাঁদবে না, হাসবে না— এমনকি কথাও বলবে না। আমরা নিশ্চিত, সে আমাদের উপহার দিয়ে গেছে নীরবতা, কেবলমাত্র নীরবতা।